بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (৪ মে ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৪ মে ২০১২-এর (৪ হিজরত, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بسْم الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবাদের জীবনের সেসব ঘটনা নির্বাচন করেছি যাতে সাহাবীদের আবেগ ও অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তাদের সেই আগ্রহ ও আবেগের যা নিয়ে তাঁরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে দেখতে যেতেন।

হযরত মিয়াঁ জহির উদ্দীন সাহেব (রা.) বলেছেন। একদিন বসেছিলাম। হঠাৎ আমার মনে কাদিয়ান যাবার দারুন বাসনা জাগল। ভাই জনাব মুনশী সিরাজ উদ্দীন সাহেবকে আমার ইচ্ছার কথা জানালাম। তখন আমার হাতে পথ খরচের জন্য এক পয়সাও ছিল না। ভাই মুনশী সিরাজ উদ্দীন আমাকে এক রূপী দিয়ে বললেন, আমার কাছে এর বেশী নেই নতুবা আরো দিতাম। তারপর আমি কাজী মনজুর আহমদকে বললাম, আমি কাদিয়ান যাচ্ছি। তিনি বললেন, আমিও যাব। পরের দিন আমরা উভয়ে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। বাটালা থেকে পায়ে হেঁটে আমরা যোহরের সময় কাদিয়ান পৌঁছলাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করে হৃদয় প্রশান্ত হল, আলহাম্দুলিল্লাহ্।

তারপর লিখেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ কতই না মজার ছিল। আমরা যখন তাঁর (আ.) কাছে পৌঁছে যেতাম স্বদেশের কথা আর মনে থাকত না। তাঁকে ছেড়ে যেতে মন চাইত না। সেদিন কাদিয়ান পৌঁছার পর দেখলাম আমার শ্বশুর কাজী জয়নুল আবেদীন সাহেবও সেখানে। আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাক্ষাত পেয়ে পরম আনন্দিত। এ সফরে আমরা কাদিয়ানে চার-পাঁচ দিন কাটালাম। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত (আ.)-এর সাথে নামায পড়ার সুযোগ দিয়েছেন। এটি একান্তই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, আমাদের মত দুর্বলদের সেই কল্যাণময় যুগে সৃষ্টি করে কল্যাণময় সত্তার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র।

হাজী মোহাম্মদ মূসা সাহেব বর্ণনা করেছেন, সে যুগে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত আমার রীতি ছিল, 'নয়া স্টেশনে' (স্টেশনের নাম) এক জমাদারের কাছে রাবারের টায়ারের একটি সাইকেল সাইকেল রাখতাম। শুক্রবার

দিন লাহোর থেকে বাটালা পর্যন্ত ট্রেনে যেতাম। তারপর সেখান থেকে ঐ সাইকেলে করে কাদিয়ান যেতাম। জুমুআর নামাযের পর আবার ঐ সাইকেলে বাটালা, তারপর ট্রেনে লাহোর এসে যেতাম। (প্রত্যেক শুক্রবার তার এটিই রীতি ছিল এভাবে লাহোর থেকে নিয়মিত জুমুআর নামায পড়তে কাদিয়ান যেতেন। বাটালা থেকে কাদিয়ান সাইকেলে ১১/১২ মাইল সফর করতেন অর্থাৎ মোট ২২ মাইল সাইকেলে সফর করতেন।)

হযরত ডা: সৈয়দ গোলাম গওস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি প্রথমবার ১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কাদিয়ান এসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করলাম। ইতিপূর্বে পত্রের মাধ্যমে বয়আত করেছিলাম ১৯০০ সালের আগষ্ট মাসে। আমি হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবকে বললাম, আপনি আমাকে এ জামাতের কোন ওযীফাহ্ বলে দিন (দোয়া বা যিক্‌র যা আমি প্রত্যহ পাঠ করতে পারব) হযরত মৌলভী সাহেব আমাকে বললেন, আমাদের জামাতের ওযীফাহ্ এটিই যে, তুমি বারবার কাদিয়ান আস। তখন চট করে আমার মনে হলো, কাদিয়ানে বাড়ী করা প্রয়োজন যেন পিতা-মাতা ও স্ত্রী-সন্তানরা এখনেই বসবাস করতে পারেন। আর ছুটি পেলেই কাদিয়ানে এসে থাকতে পারি। (বাড়ী থাকার সুবাদে ছুটি হলেই যেন কাদিয়ান এসে থাকতে পারি)। অতএব আমার কর্মস্থল পূর্ব আফ্রিকায় ফিরে গিয়েই হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের নামে ছয় শত রূপী পাঠালাম যেন আমার জন্য বাড়ি নির্মাণ করা হয়। কিন্তু তিন বছর পর যখন ফিরে এলাম তখন মৌলভী সাহেব সেই রূপী আমাকে ফেরত দিয়ে অপারগতা জানিয়ে বললেন, সুযোগ করে উঠতে পারি নি। মৌলভী সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চিলেকোঠায় থাকতেন। রূপী ফিরিয়ে দেয়ার সময় তিনি বললেন, বড় বড় এসব বাড়ি আহমদীদেরই (অর্থাৎ অ-আহমদী হিন্দুদের যে ঘর-বাড়ি ছিল) বিশেষ করে হিন্দু ডেপুটিদের বাড়ির প্রতি ইশারা করেন যেখানে বর্তমানে আমাদের অফিসগুলো অবস্থিত। তিনি লিখেন, হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব একজন শীর্ষস্থানীয় তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। তিনি একটি কথা বলেছেন আর আল্লাহ্ তা'লা তা হুবহু পূর্ণ করে দিয়েছেন। (যাহোক এসব কথা মূলতঃ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা যা তাদের ঈমানকে এতো দৃঢ় করেছে। এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এসব কিছুই আমরাই পাব এবং আল্লাহ্ তা'লাও তা সত্য প্রমাণিত করেছেন, সেগুলো আমাদের হস্তগত হয়েছে।)

হযরত মিয়াঁ যহুর উদ্দীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন মনে মনে নিজেকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! মির্যা সাহেব যদি আসলেই পীর হয়ে থাকেন আর আমরা যদি তাঁকে না মানি তবে আমাদের কি অবস্থা হবে? একদিন আমি আমার ফুপাতো ভাই মুনশী আব্দুল গফুর সাহেবকে বললাম, সকালে বা সন্ধ্যায় আমি কাদিয়ান যাচ্ছি। (এটি তাঁর বয়াতের পূর্বের ঘটনা।) তিনি শুনে বললেন, কারো কাছে বলো না, আমিও তোমার সাথে যাব। তাঁর এ কথা শুনে আমার খুবই ভাল লাগল। পরের দিন প্রত্যুষে আমরা কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সম্ভবতঃ গম কাটার মৌসুম ছিল। (অর্থাৎ গম কেটে তা গোলাজাত করার প্রক্রিয়া চলছিল) আমরা দু'জন স্টেশনে পৌঁছে টমটম গাড়িতে উঠে দেখি এক্কাতে আগে থেকেই একজন যাত্রী বসে আছেন, তিনি ছিলেন মিয়াঁ নূর আহমদ কাবলী সাহেব। যাহোক আমরা এক্কা বা টমটম গাড়ীতে উঠে যোহর নামাযের সময় কাদিয়ান পৌঁছলাম। ওযূ করে আমরা দু'জন মসজিদে মুবারকে গেলাম। মসজিদে মুবারক তখন খুব ছোট ছিল। আমাদের পূর্বেই আরো পাঁচ ছয়জন লোক সেখানে বসেছিলেন। আমি তাদের সবাইকে খুব ভালভাবে দেখলাম (অর্থাৎ মনোযোগের সাথে দেখলাম) কিন্তু আমি যার সন্ধানে ছিলাম এমন কাউকে তাদের মাঝে দেখতে পেলাম না। (অর্থাৎ তিনি

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখতে চাচ্ছিলেন কিন্তু যারা বসেছিলেন তাদের মাঝে কাউকে তেমন দেখাচ্ছিল না।) তিনি বলেন, দশ পনের মিনিট পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আসলেন এবং সরু সিঁড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। মনে হচ্ছিল, ইনিই সেই সত্তা অর্থাৎ খলীফাতুল মাসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে মসীহ্ মওউদ ভেবেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বললেন, আপনারা বসুন, হুযূর (আ.) আসছেন। (তিনি খুবই বিচক্ষণ ছিলেন বুঝতে পারলেন, তারা ভুল করছেন তাই বললেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখনই আসছেন।) তাঁর কথা শুনে আমি বসে পড়লাম এবং বুঝলাম, এখন যিনি আসবেন তিনি তাঁর চেয়ে অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর চেয়ে বড়ই হবেন। পাঁচ ছয় মিনিট পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেবক খবর দিলেন, হুযূর (আ.) আসছেন। দু'তিন মিনিট পর মসজিদে মুবারকের জানালা খুলে গেল এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মসজিদে মুবারকে প্রবেশ করলেন। তখন মনে হচ্ছিল, সূর্য যেন মধ্য গগণে (অর্থাৎ দুপুরের পুরো প্রদীপ্ত সূর্য) যেমন চেহারা দেখার আকাঙ্খা ছিল, আল্লাহ্‌র কসম! তাঁকে এরচেয়ে অনেক সুন্দর পেয়েছি। আমরা সবাই যারা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। হযরত আকদাসের আগমনে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক দাঁড়িয়ে গেলাম। তাঁর পবিত্র জ্যোতির্মন্ডিত চেহারা দেখে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করল এবং সুন্দর থেকে সুন্দর চেহারাসমূহ তাঁর সামনে ম্লান হয়ে গেল।

হযরত শেখ আব্দুল করীম সাহেব বলেন, আমি ১৯০৩ সালে লায়েলপুরের হাকীম আহমদ হোসাইন সাহেবের মাধ্যমে আহমদী হয়েছিলাম। যদিও হাকীম সাহেব লাহোরের অধিবাসী ছিলেন কিন্তু তিনি যেহেতু লায়েলপুরে কবিরাজী করতেন এবং সেখানেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন তাই তিনি লায়েলপুরী নামে খ্যাত। তিনি তার কাজের উদ্দেশ্যে করাচী এসেছিলেন। তার তবলীগেই আমি আহমদী হয়েছিলাম। ১৯০৪ সালে যখন আমি লাহোর গিয়েছিলাম তখন তার বাড়িতেই বসবাস করেছি। আমি জুমুআ পড়ার উদ্দেশ্যে 'গামটির মসজিদে' গেলাম তখন সেখানে ঘোষণা করা হল, হুযূর আসছেন আর তিনি সেখানে একটি বক্তৃতা প্রদান করবেন। অতএব এ ঘোষণা শুনে আমি সেখানে থেকে গেলাম। যখন হুযূর আসলেন তখন মিয়াঁ মিরাজ উদ্দীন সাহেবের বাড়ির নির্মাণ কাজ চলছিল এবং কয়েকটি কক্ষের নির্মাণ কাজও সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। হযরত সাহেব সেখানেই অবস্থান করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন এবং সেখানেই জুমুআর নামায আদায় করলেন। হযরত আব্দুল করীম সাহেব খুতবা প্রদান করেছিলেন এবং নামায পড়িয়েছিলেন। আমি পাগল প্রায় হয়ে ঘুরছিলাম যেন কোন না কোনভাবে হযরত আকদাসের সাথে সাক্ষাত লাভ করতে পারি। ইতোমধ্যে ডাক্তার ইয়াকুব বেগ সাহেব আমার হাত ধরে সজোরে সামনে এগিয়ে গেলেন। আমি প্রথম কাতারে হযরত আকদাসের বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি যখন আত্তাহিয়্যাতে বসলাম তখন নিজের পাপের কথা মনে করে অধিকন্তু হযরত আকদাসের কাঁধে আমার কাঁধ লাগার কথা ভেবে অবলিলায় কেঁদে ফেললাম, এমনকি হিচকি এসে গেল। হযরত আকদাস আমার এ অবস্থা দেখে আমার পিঠে তাঁর স্নেহের হাত বুলালেন এবং আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। (নামাযের পরে হয়তো হয়ে থাকবে বা নামাযের পূর্বে, মোটকথা আত্তাহিয়্যাতে বসার পরই স্নেহের হাত হয়তো বুলিয়েছিলেন, নামাযের মাঝে নয়, যাহোক এরপর লিখেন) হযরত আকদাস যখন কাদিয়ান যাত্রা করলেন তখন এ অধমও সফর সঙ্গী হয়ে গেল। কাদিয়ান পৌঁছতেই মামলার শুনানীর জন্য গুরুদাসপুর যেতে হল, আমিও সাথে গেলাম। একবার হুযূর (আ.) আসর নামাযের পর বললেন, **'মানুষ মনে করে, আমরা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেছি আর বয়আত করে ফেলেছি।**

আমাদের ক্ষমা লাভের জন্য এটিই যথেষ্ট'। (অর্থাৎ লোকেরা মনে করে বয়আত করে নিলাম তো সমস্ত কার্য সম্পাদন হয়ে গেল।) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'প্রকৃত জিনিস হল, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ। এর মাধ্যমে মানুষের তরী পার হতে পারে। আমি কেবল পথ দেখানোর জন্য এসেছি, অতএব আমি পথ দেখিয়ে দিলাম'।** এখন আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং তাঁর সাহায্য যাচনা করা উচিত আর এর জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করাও আবশ্যক আর এটিই প্রকৃত বিষয় যা উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে আর ঐ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের মূল উদ্দেশ্য।

হযরত ছাহেব দ্বীন সাহেব বর্ণনা করেন, সম্ভবত ১৯০৪ সালের ঘটনা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্বন্ধে লাহোরের আহমদী জামাত খবর পেল যে, হুযূর অমুক গাড়ীতে লাহোর আসছেন। আমরা হুযূরকে স্বাগত জানাতে রেল স্টেশনে গেলাম। সে দিনগুলোতে দুই ঘোড়া চালিত গাড়ির প্রচলন ছিল। আমরা ঘোড়ার গাড়ি প্রস্তুত করে দিলাম। হুযূর যখন গাড়িতে **আরোহণ করলেন**, আমরা যুবকরা ঘোড়ার গাড়িটিকে নিজেরা টেনে নেয়ার উদ্দেশ্যে বগি থেকে ঘোড়াগুলো খুলে ফেললাম এবং নিজেরা চালাতে চাইলাম (এটি তখন সাধারণ রীতি ছিল, সচরাচর এমনটি দেখা যেতো, এটি নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসেবে গণ্য হতো) হুযূর (আ.) আমাদের এহেন কাজ দেখে বলেন, **'আমরা মানুষকে উন্নত মানুষ বানাতে এসেছি; মানুষের অধঃপতন ঘটিয়ে তাদেরকে পশুর স্তরে নামাতে আসিনি যে তারা গাড়ি টানার কাজ করবে'।** ভাব এটিই ছিল শব্দ কিছু কম বেশী হতে পারে। যাহোক আমরা খোদ্দামরা ততক্ষণাত ইচ্ছা পরিত্যাগ করলাম এবং ঘোড়া হুযূরের গাড়ি নিয়ে যাত্রা করল। ঘোড়াকে সামনে জোতে এগিয়ে চললাম। আমি ঝট করে ঘোড়ার গাড়ির পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং সারা পথ হুযূরের উপর ছাতা ধরে রাখলাম আর এভাবে ছাতাবাহকের সেবা করার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করেছি। হুযূরের ছাতাবাহক হতে পেরে আমি গর্বিত।

চৌধুরী গোলাম রসূল সাহেব বসরা বর্ণনা করেন, ডিসেম্বর ১৯০৭ সালের সালানা জলসার ঘটনা, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জানতে পারলাম, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সকালে প্রাতঃভ্রমণে বের হবেন। সে সময় নিয়ম ছিল, যখন ভীড় বেশী হতো তখন তাঁর আশেপাশে মানব বন্ধন তৈরি করা হতো। (এই ঘটনা সম্ভবতঃ পূর্বেও আমি কোন স্থানে বর্ণনা করেছি, কিন্তু যাহোক তাঁকে একবার দেখার জন্য সেসব ব্যক্তিবর্গের উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং সেবার চেতনা ও প্রেরণা এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়) তিনি বলেন, যখন ভিড় বেশী হয়ে যেত তখন তাঁর আশেপাশে মানব বন্ধন তৈরি করা হতো। তিনি (আ.) সেই মানব বন্ধনের মাঝে হাঁটতেন। একটি নির্দিষ্ট জায়গা জুড়ে হাত ধরে মাঝখানে তাঁকে ঘিরে রাখতেন যেন ভিড়ের কারণে তাঁর গায়ে ধাক্কা না লাগে। অতঃপর আমি ও আমার সফর সঙ্গী জামাত আহমদীয়া চাক নম্বর-৯৯ দক্ষিণের আমীর মৌলভী গোলাম মুহাম্মদ গোন্দল, চৌধুরী মিয়াঁ খাঁন সাহেব গোন্দল এবং মরহুম চৌধুরী মুহাম্মদ খাঁন সাহেব গোন্দল-এর সাথে পরামর্শ করেছি, যদি খোদা তৌফীক দেন তাহলে সকালে যখন তিনি (আ.) প্রাতঃভ্রমণে বের হবেন তখন আমরা তাঁর চারপাশে মানব বন্ধন রচনা করবো। আর এভাবে আমরা ভালভাবে হুযূকে দর্শন করতে পারবো। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন এবং দর্শন লাভ করা। সকালে আমরা যখন ফজরের নামায সম্পন্ন করে বের হই তখন সবাই হুযূরের অপেক্ষায় বাজারে সমবেত হতে আরম্ভ করে। হুযূর কোন দিকে ভ্রমণে বের হবেন নিশ্চিত জানা ছিল না কিন্তু যেদিক থেকেই আওয়াজ উঠতো, হুযূর এদিকে ভ্রমণে বের হবেন সবাই পাগলের ন্যায় সেদিকেই ছুটে

যেত। কিছু সময় পর্যন্ত এমনই অবস্থা বিরাজমান থাকে। অবশেষে জানা গেল, দক্ষিণ রেতী ছাল্লের দিকে তিনি (আ.) ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হবেন। আমরা যারা আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিলাম কাপড়- চোপড় পড়ে প্রস্তুত হয়ে গেলাম, যখনই হুযূর বাইরের দরজায় আসবেন ঠিক তখনই আমরা হাতে হাত দিয়ে বৃত্ত রচনা করে তাঁকে বৃত্তের ভেতর নিয়ে নিব। আমরা এর জন্য প্রস্তুতই হচ্ছিলাম হঠাৎ দেখি, একটি বড় দলবল পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি আসছেন। বিশাল জনগোষ্ঠী ছিল আর জনাধিক্যের কারণে আমাদের বাসনা ভেস্তে গেল এবং তারা আমাদেরকে অনেকটা পদপিষ্ট করে এগিয়ে গেল। এত ভিড় ছিল যে, আমরা কাছেই যেতে পারি নি। রেতী ছাল্লে পেড়িয়ে পশ্চিম দিকে একটি লাসোড়ী গাছ (আঠালো ফল বৃক্ষ)) ছিল তিনি সেই লাসোড়ী গাছের নিচে দাঁড়ালেন এবং সেখান থেকেই তিনি মানুষের সাথে মোসাফা বা করমর্দন করতে লাগলেন। কেউ একজন বললো, হযরত সাহেবের জন্য চেয়ার আনা হোক। এতে তিনি বললেন, **'আল্লাহ তা'লা পূর্বেই আমাকে বলে দিয়েছেন, মানুষ অধিকহারে তোমার কাছে আসবে কিন্তু** (এটি পাঞ্জাবী ভাষায় ইলহাম) **'তু আর্কী না আওর থার্কী না' অর্থাৎ তুমি মানুষের আধিক্যে বা দেখা সাক্ষাতে বিরক্তও হবে না এবং ক্লান্তিও প্রকাশ করবে না'।** এভাবে তিনিও সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করলেন।

এরপর ডাক্তার উমর দ্বীন সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত আকদাস (আ.)-এর সাথে মোসাফা বা করমর্দন করার এত আকাঙ্খা ছিল যে, কয়েক বার ভিড়ের ধকল অতিক্রম করে মোসাফা করতাম এরপরও হৃদয় পরিতৃপ্ত হতো না। (কখনো কখনো ধাক্কাও লাগতো, বেশ সমস্যার সম্মুক্ষীণ হতে হতো কিন্তু তারপরও চেষ্টা-সাধনা করে মোসাফা করার চেষ্টা করতেন।)

হযরত ডা: আব্দুল্লাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, আমি বাটালা হতে কাদিয়ান যাচ্ছিলাম সে সময় একজন বয়োবৃদ্ধ অন্ধ আহমদীও কাদিয়ান যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, কোনো টমটমে আমার জন্য জায়গা হবে কী? আমি বললাম আপনি আমাদের গাড়ীতে চলে আসুন। (অর্থাৎ তিনি বিনা খরচে তাঁকে নিতে চাইলেন যে, আসুন আমাদের সাথে বসুন জায়গা আছে।) তিনি বললেন, না এভাবে নয় আমি বিনা পয়সায় যাবো না। আমার কাছে আট আনা আছে, আমি নিজ খরচে কাদিয়ান যাবো। এর দ্বারা আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মভিমান এবং হাত পাতার প্রতি ঘৃণার বিষয়টিও স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ দারিদ্রের মাঝেও চেষ্টা করে পয়সা সঞ্চয় করতেন এবং বার বার কাদিয়ান আসার চেষ্টা করতেন যাতে করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহচর্যে ধন্য হতে পারেন।

হযরত মিয়াঁ চেরাগ দ্বীন সাহেব বর্ণনা করেন, হেকীম আহমদ দ্বীন সাহেব যখন হুযূর (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য লাহোর যাচ্ছিলেন তখন আমি তার সাথে ঠাট্টা করলাম। হেকীম সাহেব উত্তরে বললেন, তুমি বেশ মানুষ তো! আপনজন হয়েও ঠাট্টা করছো। এ কথা শুনে আমি লজ্জিত হলাম এবং আমার মন গলে গেলো। তার কথা অনুসারে হুযূর (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আমিও যাত্রা করলাম। সে সময় তিনি আহমদী ছিলেন না। আমার বয়আত করার কোন ইচ্ছাই ছিল না। আমরা যখন খাজা কামাল উদ্দীন সাহেবের ঘরে পৌঁছলাম তখন জানতে পারলাম হযরত সাহেব (আ.) অসুস্থ। তাঁকে দেখার জন্য বহু লোকের সমাগম হয়েছে। হুযূর (আ.)-কে কেউ জানালো অনেক লোকের সমাগম হয়েছে, তারা হুযূরের দর্শন লাভ করতে চায়। হুযূর (আ.) জানালা দিয়ে মাথা বের করলেন। তার চেহারা দেখে আমি অনুমান করলাম এ চেহারা কখনোই মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না। কাজেই আমি বয়আত করলাম।

হযরত মালেক নিয়াজ মোহাম্মদ সাহেবের ছেলে মালেক বরকতুল্লাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, ১৯০৫ সালে জলন্ধর জেলার রাহুতে অবস্থানকালে আসরের সময় তিনি একটি পোষ্ট কার্ড পেলেন যে, হুযূর (আ.) দিল্লী যাচ্ছেন এবং সকাল আটটা বা নটার ট্রেনে 'ফাগওয়ারাহ্' স্টেশন অতিক্রম করবেন। হাজী রহমতুল্লাহ্ সাহেব এবং চৌধুরী ফিরোজ খাঁন সাহেব আমাকে দায়িত্ব দিয়ে বললেন, তুমি যুবক মানুষ এখনই যাও এবং 'কারইয়াম' জামাতকে সংবাদ দাও। অতএব আমি মাগরীবের পরে পায়ে হেঁটে কারইয়াম জামাতে পৌঁছে জামাতের সদস্যদের সংবাদ দিলাম। কয়েকজন আমার সাথেই পায়ে হেঁটে 'ফাগওয়ারাহ্' পৌঁছেন যা রাহু থেকে ত্রিশ মাইল দূরত্বে ছিল। ওখানে ফজরের নামায পড়লাম। স্টেশনে হাজীপুরের অধিবাসী মরহুম মুনশী হাবীবুর রহমান সাহেবের পক্ষ থেকে জামাতের সদস্যদের জন্য বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং দিনের বেলায় তার পক্ষ থেকেই খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ট্রেন এসে চলে যাবার পর জানা গেলো, হুযূর (আ.)-এর দিল্লী যাত্রার তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে, যে তারিখে আসার কথা ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সে তারিখে আসেন নি। অন্য কোন দিন আসবেন। এ সংবাদে আমরা নিদারুন কষ্ট পেলাম। তিনি লিখেন, ভালবাসার আতিশয্যে অনায়াসে সারা রাত পায়ে হেটে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছলাম অথচ এখন আর এক পা চলাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অর্থাৎ সাক্ষাত ও দর্শনের এই পরম ও গভীর আগ্রহ ছিল যার প্রেরণায় রাতারাতি আমরা কয়েক মাইল সফর করি। কিন্ত এখন যখন দেখলাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসছেন না, তখন পায়ে যে ফোস্কা পড়েছে তা মনে পড়তে লাগল, মর্মপীড়াও হলো। ফেরার পথে এ কষ্টের কারণে ঘোড়ার গাড়ীতে করে ফেরত আসি।

হযরত মুনশী কাজী মাহবুব আলম সাহেব বর্ণনা করেন, এটি তার আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বের ঘটনা। তিনি বলেন, আমি যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম, তখন লাহোরে হানাফী ও ওহাবী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক ধর্মীয় বিতর্ক হত। আমি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলাম, ওহাবীদের মসজিদে যাবার ইচ্ছা হল। এজন্য আমি 'চিনিয়া' মসজিদে যাওয়া শুরু করলাম। আমি যখন তাদের মসজিদে বসে বুঝলাম যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কথা ছাড়া অন্য কিছু বলে না। তখন আমি আহলে হাদীসের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। কখনো কখনো ওহাবীদের মজলিসে হযরত সাহেবের কথাও উঠত যে, তিনি কাফির এবং তাঁর মসীহ্ হবার দাবী ইসলাম বিরোধী ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বভাবতঃই আমার এদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হল। চাবুক সাওয়ারা গলির একজন আহমদী ছিলেন হযরত ওলীউল্লাহ্ সাহেব, পিতা-বাবা হিদায়াতুল্লাহ্। আমি তার কাছে যাওয়া শুরু করলাম এবং তার কাছ থেকে হযরত সাহেব সম্পর্কে কিছু জানতে পারলাম। তিনি আমাকে ইস্তেখারা করার পরমর্শ দিলেন। তার কাছ থেকে ইস্তেখারা করার পদ্ধতি শিখে ও ইস্তেখারার দোয়া মুখস্ত করে ইস্তেখারা করলাম। পরদিন রাত দু'টোর সময় আমি ইস্তেখারার দোয়া পড়ে শুয়েছি মাত্র, স্বপ্নে আমাকে একজন বললেন, আপনি উঠে নতজানু হয়ে বসুন। কেননা এখনই আপনার কাছে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) আসবেন। আমিও সিঁড়ি থেকে কারো আরোহণের আওয়াজ শুনলাম। এরপর আমি স্বপ্নের মধ্যেই দুই জানুর উপর বসে পড়ি। আমি দেখলাম, অত্যন্ত সাদা ধবধবে পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তি আসলেন এবং তিনি এক হাতে মির্যা সাহেবকে ধরে আমার সামনে দাঁড় করালেন এবং বললেন, "হাযার্ **রাজুলু খলীফাতুল্লাহি ওয়াসমাউ ওয়া আতিউ**"। অর্থাৎ ইনি আল্লাহ্র খলীফা, তাঁর কথা শোন এবং তাঁর আনুগত্য কর। এরপর তিনি চলে যান এবং হযরত সাহেব আমার পাশে দাঁড়ান এবং তাঁর এক আঙ্গুল নিজের বুকে স্পর্শ করে পাঞ্জাবী ভাষায় বলেন, {তিনি স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পাঞ্জাবী

ভাষায় বলতে শোনেন} **"আয়হুরব খলীফা কীতা আসনু মাহদী জানু"**। এ ব্যক্তিকেই প্রভু খলীফা বানিয়েছেন তাকে মাহদী বলে বিশ্বাস কর। এরপর একটি কবিতার চারটি পঙক্তি পড়েন কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি। এর অর্থও ছিল, আমি মসীহ্ মওউদ। এরপর আমি সজাগ হয়ে গেলাম। সকালে আমি স্কুলে যাবার পরিবর্তে কাদিয়ান রওয়ানা হলাম। বাটালা পর্যন্ত গাড়ী ছিল এবং প্রায় সন্ধ্যাবেলা তা সেখানে পৌঁছতো। আমি বাটালা পৌঁছে সেখানকার ষ্টেশনের সামনের ছোট মসজিদে নামায পড়তে গেলাম। মাগরীবের নামায পড়ছিলাম। তখন লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি কোত্থেকে এসেছেন এবং কোথায় যাবেন? আমি বললাম, লাহোর থেকে এসেছি এবং কাদিয়ান যাব। তারা হযরত সাহেবকে অনেক গালি-গালাজ করল এবং আমাকে সেখানে যেতে বারণ করল। যখন আমি জোরালো ইচ্ছা ব্যক্ত করলাম, তখন তারা আমাকে মসজিদ থেকে বের করে দিল। আমি ষ্টেশনে আসলাম। কিন্তু কিছু লোক ষ্টেশনেও আমার পিছু নিল এবং আমাকে বার বার কাদিয়ান যেতে নিষেধ করল। আমাকে বুঝানোর অনেক চেষ্টা করল। আমাকে বলল, তুমি যদি ছাত্র হয়ে থাক তবে আমরা তোমাকে এখানে বড় মিয়াঁর কাছে রাখব এবং তোমার পোষাক ও থাকার ব্যবস্থাও করব। কিন্তু আমি বললাম, আমি লাহোরে পড়াশুনা করছি তাই আমার এখানে পড়াশুনার প্রয়োজন নেই। আমি হযরত সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য কাদিয়ান যাচ্ছি। এতে তারা প্রবল বিরোধিতা শুরু করে কিন্তু আমি ভ্রুক্ষেপ না করে সন্ধ্যার পরই কাদিয়ান অভিমূখে যাত্রা করি। বিদঘুটে অন্ধকার ছিল। রাতের অনেকটা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল আর রাস্তাও ছিল অপরিচিত। আমি ভুলবশতঃ একটা জ্বলন্ত বাতি দেখে মাসানিয়া চলে গেলাম। (এটি কাদিয়ানের দিকেই অন্য একটা জায়গা ছিল।) সেখানে এশার নামায হয়ে গেছে। একজন মসজিদে বসে যিক্‌রে এলাহী করছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় যাবেন? আর কোত্থেকে এসেছেন? আমি বললাম, লাহোর থেকে এসেছি। হযরত মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে চাই। তিনি উত্তরে বললেন, এটা মাসানিয়া, কাদিয়ান নয়। কাদিয়ান এখান থেকে দূরে। আপনি এখানে ঘুমিয়ে পড়ুন। ভোরে যাবেন, কেননা রাস্তা ভাল নয়। কাজেই আমি সেখানেই মসজিদে ঘুমিয়ে পড়লাম আর চার্‌টার সময় যখন চাঁদ উঠলো (লেইট নাইট বা রাতের শেষ প্রহর, পূর্ণিমা ছিল)। চাঁদ উঠার সাথে সাথে আমি ঐ ব্যক্তিকে বললাম, আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দিন। তিনি আমাকে ওয়াডালা পর্যন্ত ছেড়ে গেলেন আর আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। খালের পাড়ে আমি ফজরের নামায পড়ি। আর সূর্য উঠার প্রায় এক ঘন্টা পর কাদিয়ান পৌঁছি।

কাদিয়ানের চত্তরে গিয়ে আমি একজনকে জিজ্ঞেস করি, বড় মির্যা সাহেব কোথায়? সে আমাকে বলল তিনি গোসল করে সামনের বড় ঘরে বিছানায় বসে হুক্কা পান করছেন। (মির্যা নিযাম উদ্দীনের দিকে ইঙ্গিত করছিল) বলছেন, আমি একথা শুনে যখন সামনে অগ্রসর হলাম তখন দেখি একজন বয়স্ক মানুষ গোসল করে আসনে বসে আছে, এখনও তার শরীর ভিজা আর তিনি হুক্কা পান করছেন। আমার খুবই ঘৃণা জন্মালো এবং আক্ষেপ হলো যে কেন কাদিয়ান আসলাম (অর্থাৎ এত কষ্ট করেছি, এত পরিশ্রম করলাম, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে কাদিয়ান এসে এই লোককে দেখছি!) তিনি বলছেন, আমি নিরাশ হয়ে ফেরত যাচ্ছিলাম। (আল্লাহ তা'লার পথ পদর্শন করার ছিল) পথের মোড়ে আমি শেখ হামেদ আলী নামে এক ব্যক্তির সাক্ষাত পাই। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? কার সাথে সাক্ষাত করতে চান? আমি বললাম, যার সাথে সাক্ষাত করতে চেয়েছি তাকে দেখেছি আর এখন আমি লাহোর ফেরত যাচ্ছি। আমার একথা শুনে তিনি বলেন, আপনি কি মির্যা সাহেবের সাথে

সাক্ষাত করার জন্য এসেছেন? তাহলে উনি ঐ মির্যা সাহেব নন যার সাথে আপনি সাক্ষাত করে এসেছেন, তিনি অন্য একজন। আমি আপনাকে তাঁর সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিচ্ছি। তখন আমি প্রাণ ফিরে পেলাম, আশ্বস্ত হলাম। হামেদ আলী সাহেব আমাকে বললেন, আপনি একটি চিরকুট লিখে দিন, আমি ভেতরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এতে আমি সংক্ষেপে লিখি, আমি একজন ছাত্র, লাহোর থেকে এসেছি, সাক্ষাত প্রত্যাশী। আর আজই ফেরত যাবার ইচ্ছা রাখি। হুযূর (আ.)-এর উত্তরে বলে পাঠালেন, অতিথিশালায় অবস্থান করুন, খাবার খান, যোহরের নামাযের সময় সাক্ষাত হবে। আমি এই মুহূর্তে একটি বই লিখছি। {হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বললেন, এই মুহূর্তে আমি একটি পুস্তক রচনা করছি আর এর বিষয়বস্তু আমার মাথায় রয়েছে। এখন যদি সাক্ষাতের জন্য আসি তাহলে হয়তো এ বিষয়টি আমার মাথা হতে বেরিয়ে যেতে পারে; তাই আপনি যোহরের নামায পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।} কিন্তু এই উত্তরে আমি আশ্বস্ত হতে পারিনি। আমি দ্বিতীয়বার হুযূরকে লিখি, আমি পুরো রাত অনেক কষ্ট করে এখানে এসেছি আর দর্শন লাভ করতে চাই। আল্লাহ্‌র খাতিরে আমাকে এখনই সাক্ষাতের সম্মানে ভূষিত করুন। তখন হুযূর (আ.) মাই দাদীকে বললেন, তাকে মসজিদ মুবারকে বসাও, আমি তার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসছি। আমাকে সেখানে হয়তো পনের মিনিটের মত অপেক্ষা করতে হয়েছে। এরপর হুযূর মাই দাদীকে বলে পাঠালেন, তাকে এদিকে ডেকে নিয়ে আস। হুযূর নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে গলির দিকে আসলেন আর আমিও (বিপরীত দিক থেকে) গলিতে পৌঁছলাম। দূর থেকে হুযূরের প্রতি যখন আমার দৃষ্টি পড়ল, দেখলাম এটি সেই চেহারা যা স্বপ্নে দেখেছিলাম। আমাকে যে ব্যক্তিকে দেখানো হয়েছিল বাস্তবেও সেই চেহারাই ছিল। হযরত সাহেবের হাতে লাঠিও ছিল এবং পাগড়ীও পরিধান করা ছিল; অবিকল সেই চেহারাই ছিল। যদিও এর পূর্বেই আমি দাদীর মাধ্যমে জানতে পারলাম হযরত সাহেব জামা খুলে উপবিষ্ট আছেন কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দিব্যদর্শনের দৃশ্য দেখাতে চেয়েছেন তাই হুযুর যেই পোশাক পরিধান করেছিলেন তা অবিকল সেটিই ছিল যা আমি দিব্যদর্শনে দেখেছিলাম। আমি হযরত সাহেবের দিকে যাচ্ছিলাম আর হযরত সাহেব আমার দিকে আসছিলেন। গোল কামরার একটু সামনে আমার এবং হযরত সাহেবের সাক্ষাত হয়। আমি হযরত সাহেবকে দেখেই চিনতে পারলাম, ইনিই সেই বুযূর্গ এবং সত্যবাদী যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। কাজেই আমি হুযূরকে জড়িয়ে ধরলাম এবং অঝোরে কাঁদতে লাগলাম। আমি বুঝতেই পারলাম না, আমার সেই কান্না কোথা থেকে এলো আর কেন এলো কিন্তু আমি অনবরত কয়েক মিনিট কাঁদতেই থাকলাম। হুযূর আমাকে বললেন, ধৈর্য ধরুন, ধৈর্য ধরুন। যখন আমার কান্না একটু থামলো এবং চৈতন্য ফিরে পেলাম তখন হুযূর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি বললাম লাহোর থেকে। হুযূর বললেন, কেন এসেছেন? আমি বললাম দর্শনের জন্য এসেছি। হুযূর বললেন, কোন বিশেষ কাজ আছে কি? আমি পুনরায় বললাম শুধু দর্শনই আমার উদ্দেশ্য। হুযুর বললেন, কিছু লোক বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে দোয়া করানোর জন্য আসে। আপনার এমন কোন বিশেষ বিষয় আছে কী? আমি বললাম, আমার এমন কোন বিশেষ বিষয় নেই। (এটি সম্ভবতঃ হযরত সাহেব এজন্য জিজ্ঞেস করেছিলেন, সে যুগে হুযূর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিলেন। যাতে লিখা ছিল, কিছু লোক আমার কাছে নিজ স্বার্থের জন্য দোয়া করাতে আসে।) কিন্তু আমার এ কথা শুনে তিনি খুব খুশি হলেন। মুবারকবাদ জানালেন কেননা আমার উদ্দেশ্যই ছিল তাঁর সাথে সাক্ষাত ও তাঁর দর্শন লাভ।

হযরত মালেক গোলাম হোসেন মুহাজির সাহেব বর্ণনা করেন, আমার নিজ অঞ্চলে ফিরে যাবার দু'মাস পর পুনরায় কাদিয়ান আসার আগ্রহ জাগলো। হাতে টাকা পয়সা ছিল না কিন্তু মন চাচ্ছিল যেতে, (ভাবলাম) যদি পায়ে হেঁটেও যেতে হয় তবুও যাওয়া দরকার। আমার কাছে দুই রূপী ছিল। গাড়ী থাকা সত্ত্বেও আমি পায়ে হেঁটে রুহ্তাস থেকে জেহলম আসলাম। তারপর ভাবলাম, সামনেও পায়ে হেঁটে যাওয়া উচিত। জেহলমের পুল অতিক্রমের সময় অশ্বারোহী সেনাদলের চার পাঁচজন সিপাহী দেখলাম যাদের কাছে দু'টি করে ঘোড়া ছিল। আমি তাদেরকে বললাম, আমাকে ঘোড়া দাও। তারা বলতে লাগলো, তুমি গুজরাতী তাই ভয় হয় কোথাও আবার ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে না যাও। যাহোক আমি বললাম, আমি জেহলাম জেলার অধিবাসী। রুহ্তাস থেকে এসেছি। তারা বিশ্বাস করলো না কিন্তু আমি তাদের সাথে ছিলাম কেননা তারাও রাতেই সফর করছিল। যখন দু'জন সিপাহী মাড়ালা নামক স্থানে নামলো তখন আমিও সেখানে বিছানা বিছালাম। একজন শিখ বললো, মিয়াঁ! তুমি কেন আমাদের পিছু ছাড়ছো না? (তাদের মধ্যে একজন শিখও ছিল) তোমার ব্যাপারে আমরা সন্ধিত। মাঝ রাতে তারা পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করলো। আমিও তাদের সাথে যাত্রা করলাম। পুনরায় তাদের একজন বললো, আমাদের আশংকা রয়েছে যে কোথাও তুমি আমদের ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে না যাও। আমি বললাম, তাড়াতাড়ি যেতে চাই আর আমার সঙ্গীর প্রয়োজন তাই তোমাদের সাথে যাচ্ছি। একজন শিখ বললো, ভাল মানুষ মনে হয়। তাকে ঘোড়া দিয়ে দাও। অতএব তিন মাইল আমি ঘোড়ায় চড়ে পথ পাড়ি দিলাম। রাতে উযিরাবাদে পৌঁছলাম। পুল অতিক্রমের পয়সাও তারা দিলো এবং রাতের খাবারও তারা খাওয়ালো। (অর্থাৎ সেখানে মনে হয় টোল-ট্যাক্স দিতে হতো, তাও তারা দিলো, রাতের খাবার খাওয়ালো) রাত একটার সময় পুনরায় প্রস্তুতি নিলো এবং আমাকে ঘোড়া দিয়ে দিল। দ্বিতীয় রাতে 'কামুকি' বা 'মুরিদকে' নামক স্থানে আমি অবস্থান করি। সেখানে পুনরায় তারা আমাকে খাবার খাওয়ালো। অতঃপর সমস্ত রাত হাঁটার পর সকাল সাত বা আটটার সময় লাহোর পৌঁছি। (এটি খুব সম্ভব এক থেকে দেড়শত মাইলের দুরত্ব হবে)। লাহোর পৌঁছানোর পর যেহেতু তাদের পথ ভিন্ন ছিল তাই তারা আলাদা হয়ে যায়। লাহোর থেকে সকাল এগারটার সময় গাড়ী ছেড়ে যাবার কথা ছিল কিন্তু আমি সেখানে পৌঁছলাম ৮ টায় তাই ভাবলাম তিন ঘন্টা অপেক্ষা করবে কে? (কাদিয়ান যাবার অদম্য বাসনা ছিল, তিন ঘন্টা কি অপেক্ষা করব তাই আমি পায়ে হেঁটে যাত্রা করলাম)। দেড় ঘন্টায় জালো ষ্টেশনে পৌঁছাই। ষ্টেশনে গাড়ী সম্পর্কে জিজ্ঞস করে জানা গেলো পৌনে বারটায় গাড়ী ছাড়বে। পুনরায় হেঁটে যাত্রা করলাম আটারী স্টেশনে পৌঁছাই। স্টেশনে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো, গাড়ী আসতে সোয়া একঘন্টা দেরী আছে। ভাবলাম, অপেক্ষা করে কী হবে! পুনরায় পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম। তখনো খাসা স্টেশন দুই মাইল দূরে ছিল ইতোমধ্যে গাড়ী চলে যায়। যখন খাসা স্টেশনে জিজ্ঞাসা করলাম জানা গেল পরবর্তী গাড়ী সন্ধ্যা সাতটায় আসবে। আমি পুনরায় পায়ে হেঁটেই রওয়ানা হলাম আর সন্ধ্যার পূর্বেই অমৃতসর পৌঁছে গেলাম। সেখানে আমাদের শহরের এক শেখের বাড়ীতে রাত কাটাই। সকালে সেখান থেকে ছয় আনা ভাড়া দিয়ে গাড়ীতে চড়ে বাটালা পৌঁছাই। এরপর বাটালা থেকে পায়ে হেঁটে বিকাল চার/পাঁচটার সময় কাদিয়ান পৌঁছাই। দ্বিতীয় দিন সকালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করি। চার-পাঁচদিন আরামেই অতিবাহিত করি অতঃপর অনুমতি প্রার্থনা করি। নিবেদন করি, আমরা শৈশবে দোয়া করতাম, হে আল্লাহ্! ইমাম মাহদী আবির্ভূত হলে তাঁর সৈনিক হবার সুযোগ দিও। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সফরের পুরো বৃত্তান্ত শুনালাম যে কীভাবে আমি বেশিরভাগ রাস্তা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছি

মাঝে কেবল সামান্য পথ ঘোড়ায় পাড়ি দেই। তিনি বলেন, এ কথাগুলো শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'আপনি দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন'**। তিনি (আ.) আরো বলেন, আপনি কোন কাজ জানেন কী? আমি বললাম হুযূর রুটি বানানো ছাড়া আর কোন কাজ পারি না আর তাও অতি সামান্য। তিনি (আ.) বললেন, নাম লিখিয়ে রাখুন, প্রয়োজন হলে ডেকে নিব। অতঃপর আমি নাম লিখিয়ে দেই 'গোলাম হোসেন, গ্রাম: রুহ্তাস, জেলা: জেহলম'।

এ হচ্ছে সেসব ব্যক্তির ঘটনাবলী যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের গভীর আকাঙ্খা রাখতেন আর এ উদ্দেশ্যে তাঁরা বহু কষ্ট সহ্য করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহচর্যে থেকে তারা যে কল্যাণরাজি লাভ করেন এবং ঈমানে তাঁদের যে উন্নতি হয়েছে তার তুলনায় এসব কষ্ট ছিল অতি নগণ্য ও তুচ্ছ। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন এসব ঘটনা শ্রবণ করে কেবল এর স্বাদ গ্রহণকারী না হই বরং প্রতিটি ঘটনা যেন আমাদের ঈমানের উন্নতির কারণ সাব্যস্ত হয়। (আমীন)

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনূদিত)